শিক্ষা নিয়ে দু'চার কথা

অজয় রায়*

শিক্ষা শব্দটি দিয়ে পাঠ গ্রহণ এবং পাঠ দান দুটি প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকি। অভ্যাস-চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তীকরণ বা অর্জনই হল শিক্ষা। কাজেই শুধু মাত্র মাষ্টার মশাই'র কাছ থেকে বা শিক্ষায়তনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভই শিক্ষা নয়। মানুষ বস্তুত সবচাইতে বেশী শিক্ষা লাভ করে স্বচেষ্টায়, পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ থেকে- প্রকৃতি হল মানুষের সবচাইতে বড় শিক্ষক। সত্যেন্দ্র নাথ একবার আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন 'আমরা সবাই আপনার ছাত্র আপনার লেখার মধ্য দিয়ে।' জ্ঞানী মনিষীদের লেখা, সাহিত্যিকদের রচনা জ্ঞান লাভের একটি বড় উৎস-সে হিসেবে এই সব প্রজ্ঞাবান মানুষেরা বড় বড় শিক্ষকের ভুমিকা পালন করে আসছেন যুগযুগ ধরে, সেই গৌতম বুদ্ধ-সক্রেটিসের কাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বারবার প্রকৃতি থেকে শেখার ওপর জোর দিয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি শান্তি নিকেতন আর বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন শহরের কোলাহল থেকে অনেক দুরে প্রকৃতির কোলে বোলপুরের শান্তি নিকতেন গ্রামে।

একইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে তক্ষশীলা, নালন্দা, সোমপুর প্রভৃতি এবং ইউরোপে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, উপসলা .. বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলাহলমুখর শহর থেকে বেশ দুরে প্রাকৃতিক পরিবেশে। আধুনিককালে অবশ্য এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে - বিদ্যায়তনগুলো এখন শহরের ও নাগরিক সভ্যতার অবকাঠামোর অখণ্ডিত উপাদান। এখন হল শহর থেকে যত দুরে শিক্ষায়তনের অবস্থান শিক্ষার আলোক বর্তিকা ততই নিষ্প্রভ। গণিতের ভাষায় বলতে পারি "শিক্ষা হল শহর থেকে দুরত্বের ব্যস্তানুপাতিক অপেক্ষক" (Education is the inverse function of distance from the city)।

অধুনা বাংলাদেশের যে কোন সেমিনার বা বৈঠকি আলোচনায় একটি কথা বারবার উঠে আসে তা হল আমাদের কোন শিক্ষা নীতি নেই। অথচ আমরা বলি না যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি, বাণিজ্য নীতি, আমদানী-রপ্তানী নীতি, বিচার নীতি এবং এমন কি সবচাইতে গুরুত্ব পুর্ণ দিক দেশ-পরিচালনায় কোন নীতি নেই। আছে কি নেই, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথাও নেই। বাজারে চালের সরবারাহ কম হলে বা রোজার সময় বেগুনের দাম হীরার দামের কাছে পৌঁছালেও আমরা খুব বেশী চেচামেচি করি না, সরকারও খুব বেশী বিব্রত বোধ করেন না। আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করি না যে আমাদের 'আভ্যন্তরীণ বাজার নীতি' নেই। অথচ কোন উপাচার্যের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বা অনিয়মের কথা সংবাদপত্রে এলে আমরা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু কোন মন্ত্রণালয়ের বা মন্ত্রীর দুর্নীতির খবর আমাদের ততটা বিচলিত করে না, স্বাভাবিক বলেই জনগণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কেন ? এর কারণ হল আস্থা বা সম্মানের যে স্থানগুলো এখনও জনগণ লালন করে সেগুলো হচ্ছে শিক্ষায়তন ও শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের কাছে এখনও সত্যিকার অর্থে জ্ঞান পীঠ, তীর্থস্থানের মতই পবিত্র, আর এখানকার শিক্ষকরা এখনও সমাজের চোখে জ্ঞানের আলোক বর্তিকাবাহী- তাঁরা জ্ঞান-সৃষ্টির সাধানায় নিমগ্ন। তাই এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিন্দনীয় খবর প্রকাশিত হলে জনগণ ক্ষুব্ধ হন। সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে

শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। একারণেই কোন পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হলে, বা নকলের বন্যা বইলে, শিক্ষার নামে অশিক্ষার প্রচলন ঘটলে, শিক্ষার মান অধোগামী হলে অভিভাবক মহলে, সমাজসচেতন মানুষের মধ্যে, এমন কি সাধারণ জনগণের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া, কারণ সরকার ও বিত্তবানেরা শিক্ষাকে যতই বণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করুক না কেন, জনগণ শিক্ষাকে আর পাঁচটা পণ্যের মত বিবেচনা করে না। শিক্ষকরা এখনও জাতির বিবেক বলে বিবেচিত হন, অন্যায় কাজের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে গণ্য হন সমাজের চোখে। তাই শিক্ষকের পদস্খলন ঘটলে সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়, ছাত্ররা অসফল হলে মুখ্য দায়ভাগ শিক্ষকের ঘারে চেপে বসে- আঘাত প্রাপ্ত অভিবাবকেরা ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠেন, 'স্যারেরা তা হলে কি পড়াচ্ছেন ?' কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষা মন্ত্রনালয় বা মন্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে কেই অঙ্গুলি তোলেন না।

সাধারণ মানুষও বোঝে সত্যিকার শিক্ষায় আলোকিত মানুষ দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে সর্বক্ষেত্রে- রাষ্ট্র পরিচালনায়, প্রশাসনে, দক্ষ ও ন্যায়ানুগ বিচার পদ্দতি সৃস্টিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে এবং শিক্ষা-জ্ঞানচর্চা-মৌলিক গবেষণা'র ক্ষেত্রে। সুশিক্ষায় আলোকিত মানুষের অভাবই দেশের বর্তমান দৈন্য দশার কারণ। নন্দিত তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক হারুন অর রশীদ একবার এক সেমিনারে বলেছিলেন "আমরা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বিষয়ে পাঠদান করছি বটে, কিন্তু সত্যিকার শিক্ষিতকরণ হচ্ছে না। ফলে সমাজে ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠছে না।' ফলে আলোকিত মানুষের অভাবে, এদের স্থান দখল করে আছে যে শ্রেণীর মানুষ তাদের সততা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। যে মানুষটি আজ সংসদে আমার এলাকার জন-প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হচ্ছেন তিনি কি জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধি- তিনি কি আলোকিত মানুষ যিনি আমার আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন ? এমন তর বিভিন্ন প্রশ্ন জনমনে উত্থিত হয়। অথবা যে ব্যক্তিটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পদটি অলঙ্কৃত করে, আছেন তিনি কি শুধুই অলঙ্কার- সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আসীন রয়েছেন সরকারের হুকুম তালিম করার জন্য। তিনি কি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিই শ্রদ্ধাভাজন নমস্য ব্যক্তি- তিনি কি একাডেমিক নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন ? উজ্জ্বল কিছু ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু জনগণের ধারণা এর বিপরীতটাই সত্য? রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এসব ব্যক্তির উত্থান, রাজনৈতিক ভিত্তিটা সরে গেলে এঁরা হারিয়ে যান বিস্মৃতির কৃষ্ণগহ্বরে।

শিক্ষা সমস্যা নিয়ে কথা বলার আগে শিক্ষা নিয়ে বড় বড় মানুষেরা কি ভাবতেন দু'চার জনের কথা শোনা যাক। আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন, 'মানুষকে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দান করাই যথেষ্ট নয়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলে সেই মানুষ এক ধরণের প্রয়োজনীয় যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু সুসঙ্গতভাবে বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। ... ... একজন তরুণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাছবিছার করে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে তোলাও একটি উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। .. .. শিক্ষা দানের পন্থা এমন হওয়া উচিড়, যাতে যা শেখান হচ্ছে, সেটিকে তরুণরা কঠোর কাজ হিসেবে নয়, মুল্যবান উপহার হিসেবে গণ্য করতে পারে।'

শুধুমাত্র স্কুলে লভ্য শিক্ষা থেকে পরিপুর্ণতা অর্জন সম্ভব নয় একথা আইনস্টাইন নানা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'একজন মানুষকে পরবর্তী জীবনে যেসব জ্ঞান সরাসরি ব্যবহার করতে হয়, স্কুলে সে বিষয়গুলো শেখাতে হবে। অথচ

জীবনের চাহিদা এত বহুমুখী যে, স্কুলে সেসব বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষকে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়। সব সময় স্কুলের এই লক্ষ্য থাকা উচিৎ যে, একজন তরুণ যেন স্কুল জীবন শেষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, একজন সুসঙ্গত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠে। বিশেষ জ্ঞান অর্জন নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নিজের বিচার ক্ষমতা বিকশিত করাকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে।' অপর দিকে গণিতজ্ঞ দার্শনিক এ. এন হয়াইটহেড সংস্কৃতি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলেন, " A merely well informed man is the most useless born in God's earth. What we should aim at producing is men who possess both culture and expert knowledge in some special direction."।

শিক্ষা নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল নানা কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতার সঙ্কোচন করার পক্ষে তিনি। অর্থাৎ শিশু চাইলেই তাকে যা কিছু করতে দেয়া যায় না। তিনি শিশুর যদৃচ্ছাচারিতার প্রশয় দানের প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন "শিশুটি যদি পিন গিলে ফেলতে চায়, তাহলে ?" সুতরাং তাঁর মতে, "... শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা যাঁরা বলেন, তারা এর মাধ্যমে এ কথাটি বলতে পারেন না যে, শিশুদের সারা দিন ইচ্ছে মত চলতে দেয়া উচিত। কিছুটা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। প্রশ্ন হল - কতটুকু শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায়।"

শিক্ষাব্যবস্থার দুটি মুখ্য উপাদান হল (ক) ছাত্র সম্প্রদায় এবং (খ) শিক্ষক মণ্ডলী। রাসেল স্কুলে শিক্ষকের ভুমিকার ওপর সবচাইতে গুরুত্ব দিতে বলেন। "আধুনিক বিশ্বে স্কুল শিক্ষককে কদাচিৎ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতে দেয়া হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়োগ করে, এবং যদি দেখা যায় যে, তিনি প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছেন, তাহলে তাঁকে 'চাকুরিচ্যুত' করা হয়। শিক্ষার সাথে যতগুলো পক্ষ জড়িত, তাদের মধ্যে শিক্ষক হচ্ছেন সর্ব্বোত্তম। প্রগতির জন্যে মুলত তাঁর সাহায্য আমরা নিতে পারি।" শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য হল, " .. বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী হয়। শ্রমজীবী বাবা-মা চান তাদের সন্তান দ্রুত শিক্ষা শেষ করুক, যাতে তার আয় থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। .. (অন্যদিকে) উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে পেশাজীবীরা বেশী আয় করে থাকেন, তাই তাঁরা চান তাঁদের সন্তানরাও এ সুবিধাটি যেন পায়। আমাদের বর্তমান প্রতিযোগিতামুলক সমাজে গড়পরতা বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য উত্তম শিক্ষা চান না। তাঁরা এমন শিক্ষা চান, যেটি অন্য লোকদের প্রাপ্ত শিক্ষার চেয়ে ভালো। শিক্ষার সাধারণ মান নীচু রেখেই এটা করা সম্ভব। আর এ কারণেই আমরা আশা করতে পারি না যে, শ্রমজীবী সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে একজন পেশাজীবী আগ্রহী হবেন। একজন পেশাজীবী আপন সন্তানদের জন্য যে সব সুব্যবস্থা বজায় রাখতে চান, যদি সাধারণের জন্য তাঁর সহানুভুতিশীল মনোভাব তীব্র না হয়, তাহলে তিনি সে সব সুব্যবস্থা ব্যপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সন্তানরাও পাক তা তিনি চাইবেন না।" এক কথায়, উচ্চকোটির মানুষেরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছ থেকে, তা নিম্নকোটি ব্রাত্য জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তা রাষ্ট্র ও সমাজের আধিকারীরা কোন মতেই চাইবেন না। আর এ কারণে, অন্যসব ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনাকাঙ্কিত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য পশ্চিমী সমাজ কাঠামোকে লক্ষ্য করে ও দীর্ঘকাল আগে বলা হলেও আমাদের সমাজের জন্য এখনও এর প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমাদের রাষ্ট্রচালকেরা ও সুবিধাভোগী সামাজিক পরজীবীরা চান না শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ইতর জনের কাছে পৌঁছাক। এজন্যই মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের নামে শিক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে

বাণিজ্যিক পণ্যের দৃষ্টিতে, এবং শিক্ষাকে দ্রুত বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে সচেতনভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালীর জীবন অচল। আমাদের জীবনের হেন দিক নেই যাঁর কলম স্পর্শ করেনি। শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। তাঁর কালের প্রাতিষ্ঠানিক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সব সময় সোচ্চার ছিল। বিদ্যলয়গুলি তাঁর দৃষ্টিতে 'অচলায়তন', এদেরকে অভিহিত করেছেন 'শিক্ষার কারখানা' নামে। তিনি বলতেন, "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথ সেকালে ইস্কুলের যে চিত্র এঁকেছেন আজকের ইস্কুলের হাল দেখলে মুখে কুলুপ আটতেন। সেকালে তবু সেটি এক ধরণের কল ছিল, আজ এরা 'বিকল' গোশালায় পরিণত হয়েছে। এখন এসব বিকল গোশালায় বিদ্যা তৈরী হয় না, ভেজাল বিদ্যা বিক্রয় হয় নানা চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। হতভাগ্য অভিভাবকেরা তা বাধ্য হয়ে কেনেন। ইস্কুল সম্পর্কে এ ধরণের নেগেটিভ রবীন্দ্রচিন্তার পশ্চাতে কারণ হল রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ইস্কুলগুলো হল সমাজবিচ্ছিন্ন। তাঁর ধারণায়, ".. .. বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।" রবীন্দ্রনাথের উষ্মা বস্তুত আমাদের দেশে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে পুষ্ট স্কুলের আদলে এদেশে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর প্রতি। অন্যদিকে, ইউরোপীয় পরিবেশে এই স্কুল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কারণ স্কুলগুলোর সাথে ছিল সমাজের নিবির সম্পৃক্ততা। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উচ্ছসিত প্রশংসা শোনা যায় ইউরোপীয় স্কুল সম্পর্কে, "য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে--- সেইখানেই তাহার চর্চ্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে--- সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে .. .. .. ।" আজ যদি রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় ও মার্কিনী নামের বাহারী বিশ্ববিদ্যালয, এ-ও লেভেল আর কিণ্ডারগার্টেন নামক পরগাছা বিদ্যায়তনগুলো দেখতেন, নিঃসন্দেহে মুর্চ্ছা যেতেন। তার মতে সে সময় ইংরেজরা যেমন নিজেদের প্রয়োজনে কল-কারখানা স্থাপন করেছিলেন, তেমনি ইংল্যাণ্ডের ধাঁচে ইস্কুল স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমী দর্শন আর ঐতিহ্য অনুযায়ী-- দেশের সংস্কৃতি-দর্শনকে তোয়াক্কা না করে। রবীন্দ্রনাথের এখানেই ছিল আপত্তি, -- ভিনদেশের গাছ ভিন্ন পরিবেশে অন্য প্রকৃতিতে বাঁচে না। একথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন, " এজন্যই বলিতেছি. য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল .. .. সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।" তাই বলে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায়তনকে, যেখানে মুলত গুরুর কাছে বসে তপবনে বিদ্যালাভ করা যেত, তিনি তখনকার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে, " ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোন কাজেই লাগিবে না।" এই দুই বৈপরত্যের একটি সমন্বয় করে অর্থাৎ পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের ধ্যান ধারণাকে সম্পৃক্ত করে তিনি চাইতেন এক ধরণের শিক্ষা দর্শন গড়ে তোলা যা হবে বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেনঃ "অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার

সঙ্গে অধ্যপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যলয় গ্রহণ করে। "

আমি আগেই বলেছি প্রকতি হল রবীন্দ্র মানসের এক বড়সড় রাজ্য। তিনি মনে করতেন যে বিদ্যালয়ের কথা তিনি ভাবেন তা অবশ্যই গড়ে উঠবে প্রকৃতির কোলে শহর থেকে দুরে কোথাও; তাঁর মতে, " আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দুরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।" রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের নামই হল "শান্তিনিকেতন", যে কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছিলেন, ".. .. আমি আকাশ আলোর অঙ্গশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্খা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে।" রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ "আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।" আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বই ছাড়া অন্য বই পাঠে নিরুৎসাহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, "বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না। পৃথিবীর পুস্তক সাধারণকে পাঠ্যপুস্তক ও অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা যায় না। .. .. কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; .. .. কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোন কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যাই নাই। .. .. অতএব কমিটি নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহর দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে। .. .. যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমানে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমান স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমান গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। .. .. শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।" আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষও এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন, ফলে শিশুদের স্কুল ব্যাগের বোঝা যেমন আয়তনে ও ওজনে বাড়ছে, মনের বিকাশ সে পারেমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে।

প্রকৃত ও সুশিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন, ".. .. তাহা মানুষকে অভিভুত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।" অন্যত্র আরও বলেছেন, "আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।" আমার দৃষ্টিতে রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনার মুল সুরটি হল বিদ্যায়তনের দেয়ালে আবদ্ধ শিক্ষা দান আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল হতে পারে না, কেননা জীবনের মুলে রয়েছে-- "আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে"। তাঁর ধারণায় সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে নিজেকে লালন না করে এবং সমগ্র মানব সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে বিশ্ব মানবতাকে ধারণ না করে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞানকে স্পষ্ট করে চেনা যায় না।

কাজেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি এই মানবতাবোধকে, বিশ্ব প্রকৃতির সত্তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা না থাকে তবে সে শিক্ষা নিরর্থক। আনন্দময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চ্চার ও শিক্ষার যে ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চ্চা ও জীবনচর্চ্চাকে একাত্ম করে তুলতে। তাঁর কাছে ছিল বিদ্যাচর্চ্চা জীব□চ্চাও নামান্তর–– তাই শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তিনি এক জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন -- যে জীবন থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হবে না, শিক্ষকরাও শিখবে।

গান্ধীজীও জীবনসম্পৃক্ত শিক্ষার কথা আন্তরিকভাবে ভেবেছিলেন। তিনি অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল -- এ শিক্ষা হবে সাত বছরব্যাপী, মান হবে তখনকার প্রবেশিকা শেনীর অনুরূপ, তবে দৃষ্টিভঙ্গী ও পাঠ্যসুচী ভিন্নতর। এর মৌলিকত্ব হচ্ছে এই শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক- অর্থাৎ একটি শিল্পকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। শিক্ষার বাহন হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। গান্ধিজীর নির্দেশে জাকির হোসেন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে এ ধরণের একটি বুনিয়াদী শিক্ষায়তন স্থাপন করেছিলেন, যার আধুনিকতম রূপ হচ্ছে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাকির হোসেন দেখেছেন এভাবে, "the scheme envisages the idea of cooperative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children."। মহাত্মার পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অবশ্যই হতে হবে স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর (self supporting)।

আমরা গত ত্রিশ দশকে কতটা সংস্কৃতবান, শিক্ষিত, সভ্য এবং অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি সে কথা আমি বলতে পারব না, সে বিষয়ে বলতে পারেন আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থ বিষয়ক মন্ত্রনালয়। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান বিদ্যার জনক কাজী মোতাহার হোসেন বলতেন, " কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। " আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দৈন্যদশা পরিস্ফুট তা থেকে আঁচ করা দুসাধ্য নয় কাজী মোতাহার হোসেনের মাপকাঠিতে আমরা কতটা সভ্য হয়েছি। মোতাহার হোসেন আরও বলেছেন " .. .. (জাতির) ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর ... এদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার এত গুরুত্ব ।" কিন্তু প্রশ্ন হল নীতি-দর্শনহীন ভেঙেপড়া যে শিক্ষা ব্যবস্থার রেশ কাজী সাহেবের বাল্যকালের পর এখনও বিদ্যমান তা জাতির আশা-অশাঙ্খা পুর্তিতে নেগেটিভ ভুমিকা ছাড়া আর কি করতে পারে ? সর্বক্ষেত্রেই কি জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি না ? কাজী সাহেব আরও বলতেন, "মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এরও আগে পিতামাতার মনোবৃত্তি, পারস্স্নরিক সম্পর্ক ... ইত্যাদির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার-সুত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু এ কাজেও আমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি- গত ৩-৪ দশক ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে অনেক দুরে রয়েছি। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে, আত্মসাৎ হয়েছে--- ফলে আজ অনেক সাধারণও দাবী তোলেন বয়স্ক শিক্ষার নামে এই প্রহসন অচিরাৎ বন্ধ হোক। আর এই তথা কথিত অক্ষরজ্ঞান দান ঐ ব্যক্তিটির কোন ভৌত কাজে লাগে না। কাজী সাহেব মনে করতেন যে শিক্ষা বর্তমানে চালু আছে তা নিজদেশে আমাদের পরবাসী করে তোলে, " .. .. আমরা বিদেশীর সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, কিন্তু তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজী নই। যে শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখায় বা তাদেরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি জোগায়, সে দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দুরে থাকা দরকার।" বিজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদ বহুকাল আগে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সেই দুষ্ট শিক্ষাই

আজ দুষ্টক্ষতের মত দুষ্ট মানুষের মাধ্যমে সমাজের কাঁধে চেপে বসেছে।

বর্তমান যুগে শিক্ষার দিক নির্দেশনায় রাষ্ট্র একটি বড় ভুমিকা পালন করে। মধ্যযুগে বা তার আগে শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন আগ্রহ দেখায় নি। এছাড়া রয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমা বিশ্বে রেনেসাঁর আগে শিক্ষা বিষয়টি ছিল চার্চের কর্তৃত্বাধীন। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে সুলতানী ও মোগলযুগে যা কিছু শিক্ষা কার্যক্রম মসজিদকে কেন্দ্র করেই চালিত হত, রাষ্ট্রের উদ্যোগে নামকরার মত কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের কোন জ্ঞানচর্চ্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি। বস্তুত ফরাসী বিপ্লব উচ্চতর জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে তখন থেকেই ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, জার্মান ও ফ্রান্সের মত দেশ সমুহে সর্বজনীন বাধ্যতামুলক শিক্ষা-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, অনেকটা জনগণের মধ্যে ক্যাথোলিক বিশ্বাসকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এছাড়া মনে করা হয়েছিল যে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র চর্চা অসম্ভব, মনে করা হত যে অজ্ঞ জন আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য শুধু বোঝাই নয়, দেশের জন্য অপমানকর। এছাড়া পুজীবাদী অবকাঠামো নির্মাণে দক্ষ শ্রমিক ও নানা জ্ঞানের শৃঙ্খলায় সুশিক্ষিত একটি এলিট শ্রেণীর প্রয়োজন অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যবস্থার নামে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠায় রাষ্ট্র এটিকে তার প্রয়োজনে নানা কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল শিক্ষার দিক নিয়ে রাষ্ট্রের ভুমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, " এর মাধ্যমে (শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে) তরুণ ও যুবকদের বশে রাখা যায়, ফলে আদব-কায়দা ভালভাবে শেখানো যায়, অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। .. .. (তাদেরকে) বিদ্যমান রাষ্ট্রচালিত প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সকল ক্ষমতার মৌলিক সমালোচনা থেকে বিরত থাকেতে শেখায়। এ ব্যবস্থা প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থাকতে শেখায় এবং ভিন্নতর মতবাদকে দৃঢ়ভাবে দমন করে থাকে।" আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুঁজীবাদী বা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র হল সবচাইতে নিপীড়নমুলক যন্ত্র। শিক্ষাসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে এই নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে গোষ্ঠী স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে। আমাদের সমাজে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ কজে কিভাবে ব্যবহার করছেন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সেমিনারে, আলোচনা সভায় শিক্ষা সম্পর্কিত নানা সমস্যার কথা তুলে ধরছেন দীর্ঘকাল ধরে, এবং সম্প্রতি গঠিত শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের ঘোষণা প্রত্রেও আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করবেন এর সংখ্যা বেশী হবে না। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই, তবুও দু'একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই।

এখানে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাদানের প্রণালী বা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরমধ্যে আমরা মুল তিনটি ধারা বা স্রোতকে চিহ্নিত করতে পারি:

১. 'সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা' যা শিক্ষার্থীর শ্রেনী-ধর্ম-জাত-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে এখনও সকলের জন্য অবারিত। এই ব্যবস্থাটি বলা যেতে পারে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার রেশ হিসেবে চলে আসছে যদিও এর সেক্যুলার চরিত্রকে বিনষ্ট করা হয়েছে নানা সময়ে নানাভাবে।

২. ইংরেজী মাধ্যমের নামে প্রচলিত 'কিণ্ডারগার্টেন' এবং 'ও-এ লেভেল' স্তরের নানা বিদ্যায়তন। এগুলো গড়ে উঠেছে পশ্চিমুখী আমাদের সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর কিছু মানুষের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদানের

প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন। এই স্কুলসমুহের সাংস্কৃতিক ভিত হল পশ্চিমী, কিন্তু বাংলাদেশের স্যঁতস্যেতে পরিবেশে কৃত্রিমভাবে স্থাপিত (transplanted)। এই কৃত্রিম স্কুলগুলি সম্পর্কে রবীনদ্রনাথ বেঁচে থাকলে কি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতেন, পাঠক তা আঁচ করতে পারেন আমাদের পুর্ব আলোচনার সুত্র ধরে।

৩. মধ্যযুগ থেকে চলে আসা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে থেকে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা'। ব্রিটিশ আমলে এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ১৭৮০ সালে কোলকাতায় ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক 'আলিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আধুনিকায়নের নামে এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ আমল থেকেই কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে- পঠ্যিসুচীতে ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন স্রোত। আধুনিকায়নই হোক বা পুরাতন ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকুক এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম ধর্মানুসারী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত, এবং এর মুল ভিত্তিটা হল কোরাণ ও সুন্নাহ্।

বস্তুত ১৯১৯ সালে গঠিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, যা সাধারণভাবে স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত, ব্রিটিশ ভারতে বিশেষকারে তৎকালীন বাংলাদেশে (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) পশ্চিমী লিবারেল ডেমোক্রেসির দর্শনকে ভিত্তি করে একটি পরিমার্জিত আধুনিক সেক্যুলার এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছিল। কমিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতি ছিল 'সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরঙ্কুশ স্বায়ত্বশাসন' যেখানে নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় শিক্ষকদের থাকবে সিংহভুমিকা। বর্তমানে ইউনেস্কোরের সুপারিশেও সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাধীকারের কথা বলা হয়েছে। এমন কি শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় টেক্সট বুক রচনায়, সিলেবাস প্রণয়নে, শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও শিক্ষা-উপকরণ নির্বাচনে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য নির্দেশ দান করা হচ্ছে। কিন্তু দঃুখের বিষয় আমাদের দেশের সরকার শিক্ষালয়ের অতি প্রয়োজনীয় স্বাধিকারের নীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উচ্চতম বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও সরকার তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বেসরকারী স্কুলগুলি এখন পরিচালিত হচ্ছে স্থানিক সরকারী দলীয় রাজনৈকি নেতা ও শিক্ষারসাথে সম্পর্কহীন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে, যাদের পেছনে রয়েছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। এমন কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ন্যানা চাতুরিতে সরকার তার প্রতিভুদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বহিরাগত রাজনৈতিক মাস্তানদের হাতে শিক্ষালয়গুলি বন্দী। অথচ জ্ঞান সৃষ্টির জন্য, উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের জন্য, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলেতে চাই 'মুক্তবুদ্ধি চচর্চার পরিবেশ' এবং নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন। কিন্তু বর্তমান সরকার এ নীতিতে বিশ্বাস করে না, সরকার বিশ্বাস করে শিক্ষালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর 'টোটাল কন্ট্রোল' করার নীতিতে।

১৯৭৪ সালে বিশিষ্ট রসায়নবিদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করেছিল তা স্যাডলার কমিশনের ধারাকে আরও বলবান করেছিল আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পরিবর্তিত অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে। আমার মতে একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা নির্মানে এই কমিশনের সুপারিশ মালা ছিল যুগোপযোগী ও অতি গুরুত্বপুর্ণ। এই কমিশনের সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে ' সেক্যুলার লিবারেল ডেমোক্রেসি' ও 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' (যা অনেকটা বিলেতের লেবার পার্টির অবস্থানের কাছাকাছি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই দর্শনকে ভিত্তি ধরে কমিশন

তার প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দশ্য যেভাবে চিহ্নিত করেছে তা হলঃ

- দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব
- মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব
- নৈতিক মুল্যবোধ
- সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা; প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকুলে শিক্ষা; ... সৃজনশীলতা ও গবেষণা।

খুদা কমিশন যথার্থই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর, তখনকার চালু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ৬ বছরেরর মধ্যে (১৯৮০ সালের মধ্যে) অবৈতনিক করার জোর সুপারিশ করেছিলেন। কমিশন আরও সুপারিশ করেছিলেন "... .. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।"
এই পর্বে ৫ বছরে শিক্ষার্থী বাংলা (এবং একটি ২য় ভাষা), অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান, এবং শরীর চর্চ্চা-খেলাধুলা, সঙ্গীত-চিত্রাঙ্কন এবং ধর্ম/নীতিশিক্ষা ইত্যাদি।

খুদা কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার দৃষ্টিতে প্রধান লেকুনা (lacuna) বা ফাঁক হল সেক্যুলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিলেও কমিশনকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে, আধুনিকরনের নামে বিজ্ঞানী কুদরাৎ-এ-খুদা মৌলবাদী সংরক্ষণশীল মহলের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বাম পন্থী কতিপয় ছাত্র সংগঠনও এই কমিশনের প্রতিবেদনে পরিপুর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করতে পারে নি। যেমন উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশকে তারা শিক্ষা-সঙ্কোচন বলে উল্লেখ করেছে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার সুপারিশকে পরস্স্পর বিরোধী বলে তীক্ষন্ন সমালোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য হল আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার কথা এবং উচ্চ মান বজায় ও অর্জনের অজুহাত তুলে কমিশন প্রকারান্তরে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচনের কথা বলেছে।

কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল : .. .. 'জ্ঞানদক্ষ ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন', মানবিক মুল্যবোধ ও ন্যায়বোধে সম্যক বিকশিত, কর্মানুরাগী, স্বাধীনচেতা এমন ধরণের সুশিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে ভুমিকা রাখবে, এক কথায় জাতির দিকদর্শন হিসেবে কাজ করবে। কারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য ঃ " শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জাতির অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উনমুক্ত রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সুনির্বাচন হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সাধারণতঃ প্রার্থীর মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উৎপাদনশীল বা সমাজকল্যণমুলক কর্ম অভিজ্ঞতা এবং ভর্তি পরীক্ষায় তার ফলাফল ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হবে। .. .. যে সব ছাত্র প্রতিভাবান, সক্ষম ও পরিশ্রমী বলে প্রমাণিত হবে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে। প্রতিভাবান ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তান যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। .. " এই ধরণের সুপারিশকে কি উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচন নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় কি না জানি না। তবে এটুকু উল্লেখ করা যায় যে সীমাবদ্ধতা সত্তেও কুদরাৎ-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট একটি পজিটিভ পদক্ষেপ হিসেবে অক্লেশে চিহ্নিত করা যায়। সেক্যুলার উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে সব ছাত্রসংগঠনের স্বপ্ন তারাও খুধা কমিশনের মুল

নীতিমালার সাথে খুব একটা মতদ্বৈততা প্রকাশ করে নি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ছাত্র-ইউনিয়নের সামপ্রতিক মন্তব্য উল্লেখ করতে পারিঃ " .. .. এতে বলা হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সংবিধানের চার মুল নীতির আলোকে জাতিগত, ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত নিপীড়নমুক্ত এবং বৈষম্যহীন একটি সমাজ গড়ার জন্য এই প্রতিবেদনকে সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।" (গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা (খসড়া), ছাত্র ইউনিয়ন, ফে ব্রুয়ারী, ২০০৪)। উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠানটির মন্তব্য হল, " .. .. কোন ধরণের পুর্ব ধারণার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সপ্রশ্ন বিশ্ববিদ্যা আয়ত্ত করা, অবাধ মুক্তবুদ্ধি চর্চ্চা, প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা নির্মাণ করা অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান সংরক্ষণ এবং জ্ঞান সৃষ্টিই বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক ধারণাগত জায়গা। " অন্য একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি একটি লিফলেটের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা কি ধরণের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেঃ "উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান হয়ে সামনে আসে এর মানের প্রশ্ন । উচ্চ শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বজনীন জ্ঞান, মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এর জন্য দরকার অভ্যাহত গবেষণা, নিরবচ্ছিন্ন পাঠ, চিন্তার আদান-প্রদান যা জ্ঞান বিজ্ঞানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করে।" (বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন)। ছাত্র সংগঠনগুলির বক্তব্যের সাথে খুদা কমিশনের বক্তব্যের তো কোন মৌলিক পার্থক্য দেখি না।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলেই মানের ওপর জোর দিয়েছেন। যে কোন সমাজের অগ্রগতির সুচক হল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে ঐ সমাজের উচ্চশিক্ষার অবস্থান বা মান। বাংলাদেশের কোন স্তরের শিক্ষাই আন্তর্জাতিক মানের তুল্য একথা কেউ বলবেন না। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হলেও শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার সমস্যা-সমাধানের লক্ষ্যে কোন কমিশন গঠিত হয় নি। স্যাডলার কমিশন বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান কল্পে গঠিত হলেও এর একটি সার্বজনীন দিক ছিল- বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অন্যস্তরের শিক্ষা সমস্যা নিয়েও কমিশন সুপারিশ করেছিল। ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সালে গঠিত রাধা কৃষ্ণান কমিশন মুলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধান দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিৎ সেজন্য গঠিত হয়েছিল। রাধা কৃষ্ণানের সুপারিশ অনুসরণ করে ভারত আজ বিজ্ঞান জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা জগতে তৃতীয়। রাধা কৃষ্ণান কমিশনের চুম্বক কথাগুলি ছিলঃ

> If our universities were to be the makers of future leaders of thought and action in the country as they should, our degrees must contain high standard of scholarly achievment in our graduates.

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ড. হারুন অর রশীদ আমাদের উচ্চশিক্ষার দৈন্যদশা দেখে হতাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, " বাংলাদেশে ' high standard of scholarly achievment ' -এর ধারণা অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের কথাই ধরুন অথবা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের কথাই ধরুন। এসব নিয়েগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের মাপকাঠি একটাই- এবং সেটা কি, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না। ভারতে রাধাকৃষ্ণান কমিশন সাবধান বানী উচ্চারণ করেছিলেন ' শিক্ষক রাজনীতিবিদগণ অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলছেন। দলীয় প্রভাবে অযোগ্য লোক উচ্চ পদ পাচ্ছে।' কিন্তু বাংলাদেশে এই সাবধানবাণী দেয়ারও

কেউ নেই, কেন না বর্তমান সরকার কান দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না।

উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে উলিখিত মহৎ আদর্শের নিরীখে যদি আমরা উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিচার করি তাহলে আমাদের কান্না পায়। আমাদের তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও রাষ্ট্রীয় অর্থে চালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বস্তুত কোন উচ্চশিক্ষা দেয়া হচ্ছে না, উচ্চশিক্ষার নামে সেখানে চলছে এক ধরণের প্রহসন। সেখানে গবেষণা নেই- জ্ঞান চর্চা নেই - সে পরিবেশও নেই, এবং নেই কোন অবকাঠামো, পরিবেশ এবং ভৌত সুবিধাধি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলছে বন্ধ্যাত্ব।

কিন্তু দুঃখের বিষয় খুদা কমিশনের প্রগতিশীল সুপারিশগুলোকে বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেবার আগেই আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়। তবে খুদা কমিশনের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশী শাণিত আক্রমণ চালিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে। কারণ এরা লোকায়ত যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয় - মৌলবাদী আদর্শে ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এদের আস্থা।

আর এরই ফলশ্রুতিতে প্রণীত হল বর্তমান বি.এন.পি-জামাতি জোট সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের (২০০৩) প্রতিবেদন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা। এ কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই কারণ ধর্মের মোড়কে যা চলছে সেই নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থকেই রক্ষা করার সুপারিশ করেছে। মৌলিক নীতিমালা সমুহ শিরনামের সুচনা অধ্যায়টির ৮ নং বক্তব্যে বলা হচ্ছে ঃ "শিক্ষা কাঠামো : বর্তমানের শিক্ষা কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়।" কমিশন যে সরকারের তল্পীবাহক হিসেবে কাজ করছে তার স্বাক্ষর রেখেছে যখন বেগম খালেদা জিয়া সরকার প্রণীত (২০০৩) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে (একুনে ২২টি!) এটি বিনা অভিক্ষায় আত্মীকরণ করে নিজেদের সুপারিশ হিসেবে প্রতিবেদনে স্থান দেয়। টীকায় বলা হয়েছেঃ 'উপকমিটি এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন/সংশোধন/পরিমার্জন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।' কমিশন সরাসরি মৌলবাদীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মীয় ঝোঁক ও দৃকভঙ্গি দেওয়ার সুপারিশ করেছে। উদ্ধেশ্য হল সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সেক্যুলার চরিত্র বিনষ্ট করে যতদুর পারা যায় ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার কাছকাছি নিয়ে আসা। এভাবেই কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য দুর করতে চান (ংরপ)। এটি পরিস্কার বোঝা যায় যখন খালেদা জিয়া সরকার প্রণীত প্রাথমিক 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র দ্বিতীয় ধারার প্রথমটিই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার সুপারিশ করে ঃ 'শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মুল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।' বাক্যটির অংশ বিশেষ লক্ষ্য করুন 'যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায়'। একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারী ছাত্র-ছাত্রীরা, যে ধর্মবিশ্বাসের মানুষ বাংলাদেশের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ, কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মন সৃষ্টি হবে না ও মুক্তবুদ্ধির মানসিকতার বিকাশ ঘটবে না। সমাজ অচিরেই সৃষ্টিবিমুখ ও মুক্তচিন্তা বিমুখ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হবে। এ ধরণের আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়িয়ে আসা শিক্ষিতরা যদি এই বিশেষ ধর্মের দর্শন, নীতি ও আদর্শে উজ্জীবীত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, তাহলে বাংলাদেশ অচিরাৎ একটি ইসলামী মৌলবাদী মনোলিথিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যার ভিত্তিটি হবে কোরাণ ও সুন্নাহ, যেখানে অমুসলমান বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর কোন অবস্থান স্বীকৃত হবে না। আমরা কি এই রাষ্ট্র

ব্যবস্থাই আমাদের প্রিয় মাতৃভুমিতে প্রতিষ্ঠা করতে চাই ? আমি এই শিক্ষা কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যের এই দিকটির প্রতি মুক্ত মন নিয়ে আর একবার ভেবে দেখতে বলি। আমরা কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 'একজন খাঁটি মুসলমান, একজন বিশুদ্ধ হিন্দু , একজন গোঁড়া খ্রীস্টান ও একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ মানুষ তৈরী করতে চাই, নাকি একটি সর্বজনীন সেক্যুলার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তৈরী করতে চাই একজন 'মুক্তমনা মননশীল মানুষ, যিনি হবেন বৈশ্বিক মানবিকতা বোধে উচ্চকিত বাংলাদেশের নাগরিক- যার পশ্চাদপটে থাকবে একটি সৃজনশীল উৎপাদনমুখর মন, যে মন তৈরী হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্পর্শে, জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায়।

এর পাশাপাশি কুদরাত-এ-খুদার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে লক্ষ্য করুন : ১. শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। ২. শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যাবসায়, শ্রম,সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন। ৩. মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে সব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের কিছুটা পরিচিতি। ৪. পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি। লক্ষ্য করুন ২২টির জায়গায় মাত্র ৪ টি (পরিমিতি বোধেরও বোধ হয় প্রয়োজন আছে)।

মনিরুজ্জামান মিঞা ধরেই নিয়েছেন, বাংলাদেশ একটি মনোলিথিক ইসলাম ধর্মাবলম্বীর দেশ, অতএব শিশুদের প্রথমত মুসলমান বানানো ফরজ, তারপর অন্য কিছু। মিঞা কমিশনের ১ম সুপারিশটি (৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য) হুবহু খুদা কমিশনের সুপারিশ থেকে তুলে আনা হয়েছে। মিঞা কমিশনের শিক্ষাদর্শন ও নীতি সম্পকে কোন ধারণা নেই। তাই উদ্দেশ্য-লক্ষ্য করণীয়, কি পড়ানো হবে না হবে, সবকিছু ৩০টি উপাদান গুলিয়ে এক পাঁচমিশেলী পাচন তৈরী করে 'মৌলিক নীতিমালা' নামে পরিবেশন করা হয়েছে। কমিশনের চিন্তা ভাবনা যে এতো এলোমেলো হতে পারে প্রতিবেদনটি হাতে না নিলে বোঝা যেত না।

এই কমিশন একদিকে সাধারণ শিক্ষাকে ইসলামী লেবাস পড়াবার চেষ্টা করেছেন, আর এর পাশাপাশি পশ্চাদমুখী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাকা পোক্ত রূপ দেবার জন্য, এবং বাংলাদেশকে ইসলামী উম্মার কাছকাছি আনবার জন্য ২০০২ সালে বি.এন.পি-জামাত সরকার গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশসমুহ কোন বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ ছাড়াই মেনে নিয়ে অবাস্তব সব প্রস্তাবনার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক দেয়া 'ফাজিল' পাশ ছাত্রকে অন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের সমতুল্য এবং অনুরূপভাবে 'কামিল' পাশ ছাত্রকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রীধারী হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। এবং এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ আর একটি দুষ্টক্ষত সৃষ্টির সুপারিশ করেছে এই কমিশন, যার নাম হবে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যলয়। একেই বোধ হয় বলা যায়, 'এক রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।' জনাব মনিরুজ্জামান মিঞা আবার মাদ্রাসা শিক্ষায় কোন গবেষণা হয় না বলে দুঃখ পেয়েছেন, এবং যাতে গবেষণা চালু হয় এর জন্য সুপারিশও করেছেন। কমিশন বোধ হয় ভুলে গেছেন 'মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞান সৃষ্টি' এবং যে কোন সৃষ্টিশীল কাজের জন্য চাই মুক্ত পরিবেশ মুক্তবুদ্ধি-চর্চার পরিবেশ, মুক্ত চিন্তা করার পরিবেশ, অনুসন্ধিৎসু মন বিকাশের পরিবেশ। মাদ্রাসা শিক্ষায় এর বিপরীতটাই সত্য - এখানে অন্ধত্ব আর কুপমণ্ডুকতার পরিবেশ বিরাজ করে। এই পরিবেশে গবেষণা হয় না, মুক্তমনা-মুক্তচিন্তার উদার মানুষ তৈরী হয় না।

আমরা এবার দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনায় আনতে চাই: ইংরেজী মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলো নিয়ে। আমরা প্রতিষ্ঠাতাদের বাণিজ্যিক মনোভঙ্গির যতই সমালোচনা করি না কেন, ব্যাঙের ছাতার মত এগুলো গজিয়েছে এমনটি বলা ঠিক হবে না। সমাজে এক ধরণের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় অনুভূত হয়েছে নইলে এদের রমরমা বাণিজ্য চলছে কেমন করে। এ ধরণের বিদ্যায়তনগুলি আমাদের সমাজের উপরতলার মানুষ ও বিত্তবানদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা প্রদানের দায়ভাগ বহন করছে। এই স্কুলগুলোর ভিত্তিটাই হল পশ্চিমী সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, যার সাথে দেশজ সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যের খুব একটা সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ অভিভাবকদের বাসনা এ সব স্কুল থেকে পাশকরা তাদের সন্তানেরা আমেরিকা বা বিদেশে পাড়ি জমাবে ভাগ্যান্বেষে- ভাল বিদ্যালাভের আশায়, ভাল চাকুরীর সন্ধানে। এখানকার উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ইংরেজী বলায় চৌকস হবে, দেশে বসেই পশ্চিমী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পুষ্ট হবে। এরা দোতারা কি জানবে না, কিন্তু গিটারে সুরের মু□র্ছনা তুলে আমাদের আপ্লুত করবে, শেখ মুজিব'কে চিনবে না-- কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনের নাড়ি নক্ষত্র জানবে, পাণিপথ কোথায় জানবে না- কিন্তু ওয়াটারলু যুদ্ধ কবে কোথায় সংঘঠিত হয়েছিল বলতে পারে অবলীলায়; ফরিদা পারভিন কোন সঙ্গীত চ□র্চা করেন বলতে না পারলেও জুন বায়েজের গান গাইতে তাদের অসুবিধা হয় না। এসব ছাত্ররা মেধায়, বুদ্ধিমত্তায়, সপ্রতিভতায় বেশ চৌকস, এবং সমাজের হতে পারত এক ধরণের অ্যাসেট। আমাদের প্রশ্ন হল যারা এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন এবং পরিচালনা করছেন তারা সমাজের কোন সেবাটা করছেন ? এসব উৎপাদিত পণ্যরা সমাজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করছে, কোন উপকারে লাগছে ? যে মুল্যবান পণ্য আমরা রপ্তানী করছি এতে গ্রহীতা দেশগুলো লাভবান হ□ছ, কিন্তু আমরা দরিদ্রতর হ□ছ এই মেধাবী সন্তান-সন্ততির সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে। দরিদ্র বাংলাদেশের সমাজে এ ধরণের বিদ্যায়তনগুলো পরজীবী হয়ে বেড়ে উঠছে বিত্তবানদের প্রশ্রয়ে। এমন কি মনির□জ্জামান মিঞার কমিশনও এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে, "পাঠ্য পুস্তকের অধিকাংশই দেশের বাইরে প্রণীত ও মুদ্রিত। ফলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন এসব পুস্তকে থাকে না। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভুগোল সাধারণত এসব বিদ্যালয়ে কম গুর□ত্ব পায়।"

আমাদের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় তথাকথিত ধর্ম ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক টোল, সংস্কৃত কলেজ ও পালি কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাও এদেশে ঐতিহ্যগতভাবে চালু আছে, যদিও এই ব্যবস্থা বর্তমানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজেও কোন তাৎপর্য বহন করে না; একারণে মিঞা কমিশনের প্রতিবেদনে এদের সম্পর্কে এক লাইনও লেখা হয় নি। যে কোন ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণমনা, অনুদার, একদেশদর্শী, এবং কুপমণ্ডুক ও গোরামী মনোভঙ্গীর মানুষ সৃষ্টি করতে বাধ্য। কারণ রাষ্ট্রের চাইতেও ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমুহ (যেমন চার্চ বা মসজিদ), চায় এমন সব একদেশদর্শী মত ও বিশ্বাস শিক্ষার্থীর মগজে গেঁথে দিতে যা শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসু মনের বিকাশকে অবর□দ্ধ করে দেয়- তাকে করে তোলে যুক্তিহীন উপাদানে। এদের কাছে যুক্তি নয় বিশ্বাসই হল মুল কথা। উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কহীন বলে এধরণের শিক্ষিত মানুষেরা সমাজের কোন কাজে আসে না, এরা পরজীবী হয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দেখা দেয়। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পড়□য়ারা একটি জলনির□দ্ধ কোটরে (watertight compartment) বাস করে ফলে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে এদের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে এ ধরণের বিভিন্ন কোটরাবদ্ধ শিক্ষা শিশু ও তর□ণদের মধ্যে গোরামী সৃষ্টি হয় যা নৈতিক দিক দিয়ে অন্তত্য ক্ষতিকর। তিনি মন্তব্য করেছেন, " ক্যাথোলিক স্কুলের ছেলেরা মনে করে প্রোটেষ্টানরা পাপী, ইংরেজীভাষী একটি দেশের যে কোন স্কুলের শিশুরা বিশ্বাস করে নাস্তি□কেরা শয়তান, ফ্রান্সের শিশুরা মনে করে

জার্মানরা দুর্বৃত্ত, আবার জার্মানীর শিশুরা মনে করে ফরাসীরা দুর্বৃত্ত।" আমাদের দেশের মুসলমান ছাত্ররা মাদ্রাসায় অথবা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের ক্লাশে শেখে 'ইসলামই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্য ধর্মগুলো নিকৃষ্ট-সত্যের অনুসারী নয়।' এ ধরণের শিক্ষার্থীর কাছে একজন হিন্দু 'কাফের' ও পৌত্তলিক। তাই সে যখন তার সহপাঠীর মধ্যে কোন হিন্দু শিক্ষার্থীকে আবিষ্কার করে বা একজন মাদ্রাসার তালেব-এলেম রাস্□ায় কোন হিন্দুকে দেখে তখন সে তাকে কৌতুহলি দৃষ্টি নিয়ে দেখে এবং তার সঙ্গ দ্র□ত ত্যাগ করে পালাতে চায় বা অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখে। আবার একজন হিন্দু ছাত্র তার মুসলিম সহপাঠীকে অপবিত্র জ্ঞান করে, কেননা সে তার ধর্মের ক্লাশে শিখে এসেছে ' বেদই হল সকল সত্যের আধার, আর মুসলমান আর খৃষ্টানরা হল ম্লে□ছ ও অস্পৃশ্য।' মৌলভী, পাদ্রী আর পুরোহিতরা ধর্ম ও ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থায় এর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সাথে সাথে শেখানোর কৌশলটিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এত সুন্দর করে তুলে ধরেণ যে শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্□া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অভিযোগ রয়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলবাদী সন্□াসের কেন্দ্র ও চারণভুমি। এটিই হল ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সবচাইতে বড় বিপদ।

মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা সম্স্লর্কে ড. কুদরাত এ খুদা কমিশনের মুল্যায়ন হল : "ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া .. .. আরবী ভাষা সাহিত্য, .. ইংরেজী ও বাংলা ভাষা মাদ্রাসায় শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অন্□র্ভুক্ত রয়েছে, তবে ইসলামী শিক্ষার উপরই বেশী জোড় দেওয়া হয়।, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্স্লর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদানই মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (কমিশনের প্রতিবেদন, ১১.২ অনু□ছদ)। সে সময় বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যে মুল নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা হল, "জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিক স্□রটিকে সমপরিসর ও একীভূত করা এবং পরবর্তী স্□রগুলিকেও সমপরিসর ও যথা সম্ভব সমন্বিত করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহার করা।" খুদা কমিশন এই সুপারিশের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্স্লুর্ণ বিলোপের সুপারিশ না করে লোকায়ত ও মাদ্রাসা ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা এই দুটি পদ্ধতিকে কাছকাছি আনার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছু সংস্কারের সুপারিশ করে আশা প্রকাশ করেছেন, " .. .. আমরা আশা করি এরূপ সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবি□ছদ্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেবে।" খুদা কমিশনের পর বিভিন্ন সরকার মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিকায়ন ও সংস্কারের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে কিন্তু বিজ্ঞানী খুদার আশা অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা " নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেবে " পুরণ হয় নি। এ ধরণের প্রত্যাশাকেই বোধ হয় বলে 'দুরাশা'। তাত্বিক পদার্থবিদ অধ্যাপক হারুন অর রশীদ মাদ্রাসা শিক্ষার পশ্চাতে এই অপচয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেছেন, "সন্দেহ নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে সরকার যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালছেন তার উদ্দেশ্য সম্স্লুর্ণ রাজনৈতিক। শিক্ষা মন্ত্রীসহ সরকার দেশকে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চান এ সম্বন্ধে দেশের মানুষ মোটেই সচেতন নয় বলে আমার মনে হয়।"

মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বৈষম্য-অনৈক্যর কথা (বর্তমানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধারা সমাজে আর্থ-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসমতা সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক সংহতি বিরোধী।) মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশনেও উল্লিখিত হয়েছে (মৌলিক নীতিসমুহ, ৯ নং অনু□ছদ)। কিন্তু এতদ সত্তেও এই বৈষম্যাদি লুপ্ত না করে বৈষম্যাদি টিকিয়ে রাখার পক্ষে মন্তব্য করে বিভিন্ন ধারার মধ্যে তথাকথিত সমন্বয় বৃদ্ধি ও নৈকট্য স্থাপনের পক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হল ঃ " .. .. যেহেতু এসব

ধারা পরিবর্তন করা বাস্তব সম্মত নয় সেহেতু অন্□ত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্□ত অংশ যাতে সমসত্ত্ব বিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিক্যুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।" অসহায়ের আত্মসমর্পন আর কাকে বলে ? এই সমসত্ত্ব বিশিষ্টতা কি তা এই কমিশনের বিদগ্ধ সদস্যরাই ভাল ব্যখ্যা দিতে পারবেন। করিকুলাম আর পাঠ্যসুজীতে পরিবর্তন সাধন করেই যদি বিভিন্ন ধারার বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য দুর করা যায় তাহলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা নীতি ও লক্ষ্যের কথাগুলোর অস্তিত্ব থাকে কি ? প্রসঙ্গত উল্লেখ করি মাদ্রাসা শিক্ষার "উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনী জীবন-যাপনে অভ্যস্থ রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে-সুরতে প্রকৃত মুমিনরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।" (মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি, ২০০২)। অন্য শিক্ষা পদ্ধতির সাথে উল্লিখিত মাদ্রাসা শিক্ষার নীতিগত পার্থক্য কি এসব শিক্ষা ব্যবস্থার জঙ্গী সমর্থকরা 'সমসত্ত্বতা'র বেদীতে বিসর্জন দেবে ? সোনার পাথরবাটি হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির (২০০২) মতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার উৎস বিন্দু হল নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হজরত মুহম্মদ মক্কা মুকাররামায় প্রতিষ্ঠিত 'দারুল আরকামে' যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন। এবং বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা 'রাসুলুল্লাহ প্রবর্তিত সেই শিক্ষা ধারার উত্তরাধিকার।' ড়্গাংলাদেশে এই শিক্ষার লক্ষ্য হল, " .. .. (এ ব্যবস্থার) দুটি বিশেষত্বের একটি হ□ছ মৌল বা চিরন্□ন, আর অন্যটি হ□ছ পরিবর্তনশীল বা সংস্কার যোগ্য। প্রথমটি কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত তাওহিদ, রিসালাত আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক নকল কার্য অল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তন করার সর্বোচাচ প্রয়াস। দ্বিতীয়টি হ□ছ এমন একটি বিধিবদ্ধ চলমান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে স্থান-কাল ভেদে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন।" বলাবাহুল্য শেষোক্তটি গৌণ, এবং পরিমার্জনা ও সংস্কারও হতে হবে বিধিবদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয় প্রথম বিশেষত্বের সাথে পরিপুরক হতে হবে, বিপরীত বা অসঙ্হত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষায় তথাকথিত আধুনিকায়নের চেষ্টা সোনার পাথরবাটি তৈরীর মত অপচেষ্টা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির (২০০২) সুপারিশ ক্রমে মি্এঞা কমিশন সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে তথকথিত বৈষম্য দুরীকরণ ও উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছে, যার সারমর্ম আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অনুগ্রহপুষ্ট বুদ্ধিজীবী মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন সম্স্লর্কে ছাত্রদের মুল্যায়ন মোটেই সুখকর নয়। এটি তারা বর্জনের ডাক দিয়েছে। এর সুপারিশকে এরা 'ছাত্র স্বার্থবিরোধী, বৈষম্যমুলক' নামে অভিহিত করেছে। একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিবেদনটি সম্স্লর্কে মুল্যায়ন করেছে এভাবে, " .. .. ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলের শিক্ষা কাঠামো ভিন্ন আদলে আজও আমাদের ওপর চেপে বসে আছে, তার ওপর এই কাঠামোর অধীনেই ধীরে ধীরে একে চরম দেউলিয়া অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমান জোট সরকার নিযুক্ত মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও এ অবস্থা পরিবর্তনের ন্যুনতম উদ্যোগ নেই। উপরন্তু সম্রাজ্যবাদী আধিপত্যেও ক্ষেত্র প্রসারের লক্ষ্যে মগজে দাসত্বেও শৃ□খল প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে। " এই কমিশন সম্স্লর্কে ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য হল - "যখন আমরা এই প্রস্□াবনা সকলের সামনে হাজির করছি, সেই সময় ক্ষমতা কুক্ষিগত কওে রাখার প্রক্রিয়ায় বর্তমান সরকার তার রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটাতে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। .. .. ইতোমধ্যে এই শিক্ষা কমিশন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার দর্শন এবং বৈষম্য প্রসঙ্গে পর্বোক্ত ধারণাই অনুসরণ করছে। " অন্যদিকে সমাজতান্ি□ক ছাত্রফ্রন্ট মনিরুজ্জামান কমিশন-প্রতিবেদন নিয়ে একটি বিশদ

বিশ্লেষণমুলক লেখায় এর মৌলবাদী ও সামপ্রদায়িকতা চরিত্র তুলে ধরে। এরা এটিকে শিক্ষা সঙ্কোচন সার্বজনীন শিক্ষা দান ও অভিন্ন শিক্ষা বিরোধী পদ্ধতি, ও শিক্ষায়তনগুলির স্বায়ত্বশাসন হরণকারী একটি দলিল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। (অভিমত, মে ২০০৪)।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার বৈষম্য দুরীকরণের লক্ষ্যে দুটি কমিশনের কোন সুপারিশের সাথেই একমত নই। সমস্যাটি 'কারিক্যুলাম বা পাঠ্যসুচীগত' নয়, অর্থাৎ মাদ্রাসার পাঠ্যসুচীতে কতটা গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী ও বাংলা অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটা নয়, সমস্যাটি দর্শনগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি সেক্যুলার উদার গণতান্ত্রিক হয়-- এর অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের হয়, তাহলে যে কোন ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোয় অচল বা মিসফিট। আমাদের সমাজের মুল ভিত্তিটিই হল 'বহুমাত্রিকতা, বৈচিত্রময়তা এবং বহুত্ববাদিতা' (pluralism)- জনসংখ্যা মুসলিম সংখ্যগোরিষ্ঠ হলেও, এদেশে রয়েছে নানা ধর্ম, জাত ও সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই বাঙালী সমাজের মুল সুত্রটি হল 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' (Unity in diversity)। আর আমাদের জীবন দর্শনের এই বিচিত্রতার কথা আমাদের লোককবিদের কণ্ঠে চমৎকারভাবে গীত হয়ঃ

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

বৈশ্বিক মানবতা বোধই হল বাঙালী দর্শনের মুল সুত্র, তাই বাঙালী দেখে সর্ব 'জীবে ব্রহ্ম' এবং নরকে বলে নারায়ণ। মানবতাবেধে উদ্দীপ্ত বাংলার কবি তাই দরাজ কণ্ঠে উচচারণ করতে পারেনঃ

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

আমাদের লোকায়ত উদার গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রের এটিই হওয়া উচিত মৌল নীতি যার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর আমাদের এই বৈশ্বিক মানবতার বাণীই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষা-দর্শন।

আমি মোটা দাগে শিক্ষা সমপর্কে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করেছি। শিক্ষা দর্শন ও নীতি নিয়ে সামান্য কয়েকটি কথা বলে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানতে চাই। দর্শন হল 'সত্য ও জ্ঞান' এবং এতে উপনীত হওয়ার পথ। তাই শিক্ষা দর্শন হতে পারে কি পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। দর্শনের আর একটি সমতুল্য অর্থ হল দৃষ্টিভঙ্গী-- জীবন ও জগৎ সম্স্লর্কে । জীবন বলতে আমি আমার সকল কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা সামগ্রিক অর্থে বুঝি। সুতরাং দর্শন হল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি। আর এই অর্থেই আমি শিক্ষা দর্শনকে বুঝতে চাই। আমার কাছে শিক্ষা দর্শনের মুলে থাকবে থাকবে সমাজবন্দী বা রাষ্ট্রীয় নিয়মে সতত আবদ্ধ ব্যক্তি মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাময় সৃষ্টিশীলতাকে সঞ্জীবিত করা তাকে জাগরিত করা, এবং ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজের নানা শেঁকলে বাধা ও আরষ্ট বুদ্ধি ও মনকে বিকশিত কওে তোলা। মানুষের এই সৃষ্টিশীলতা বিজ্ঞানে, শিল্পে, সুকুমার বৃত্তিতে এবং

উৎপাদন ব্যবস্থায়–– এক কথায় আমাদের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাবে–– যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে করবে উন্নত আধুনিকতার দৃষ্টিতে, প্রগতিশীলতার দৃষ্টিতে।

এই দর্শনের ভিত্তিতে, যার মুল সুরটিই হল মানবতার বাণী, প্রণীত হবে শিক্ষা নীতি, যা সরকার বদল হলেই পরিবর্তিত হবে না, যাকে অবলম্বন করে গড়তে হবে শিক্ষা কাঠামো-পাঠ্যসুচী-পাঠ্যক্রম-শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি ভিন্ন উপাংশ। এ নিয়েই আমাদের সম্স্লুর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা বা সিসটেম। এই সিসটেমের প্রতিটি উপাংশের মধ্যে থাকবে পারস্স্লরিক মিথষ্ক্রিয়া-- এ্ই সিসটেমের সাথে বর্হিজগতের অর্থাৎ সমাজের ঘটবে সতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমাজে সৃষ্ট হবে সামাজিক গতিশীলতা বা (social mobility)। এই দৃষ্টিতেই আমি শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখতে চাই।

আমি আর একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধটির উপসংহার টানতে চাই। আমি বলেছি আধুনিক রাষ্ট্র একটি নিপীড়ক যন্ত্র, অথচ আমাদের সকল চাহিদা-দাবী-দাওয়া ঐ রাষ্ট্রটির কাছে। আমরা গান্ধিজীর স্বপ্নদেখা গ্রামীন পরিবেশ তৈরী করতে পারবা না, এবং সেই গ্রামে প্রত্যাবর্তনও আর সম্ভব নয়, অথবা রবীন্দ্রনাথের তপোবন শান্তিনিকেতনেও আমরা হয়তো যেতে পারব না, কিন্তু তারা যে দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল শিক্ষায়তনগুলি হওয়া উচিত স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর, এবং শিক্ষা হবে জীবনমুখী-জীবনঘনিষ্ট। এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই– এই প্রশ্নটি আপনাদের সামনে রেখে আমি বিদায় হচ্ছি।**

---

* শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক; মুক্ত-মনা সদস্য

** গত ২৩শে ডিসেম্বর (২০০৪), শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের ভিত্তিতে লেখা।